বিচারপতির রায় যুগান্তকারী এবং তা অত্যন্ত সাধুবাদযোগ্য

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী এক যুগান্তকারী রায়ে জানিয়েছেন যে, শিক্ষাদানের সময় কোনও শিক্ষককে অন্য কাজে ব্যবহার করা যাবে না। দেরী হলেও এই সিদ্ধান্তগ্রহণ অত্যন্ত সাধুবাদযোগ্য, সন্দেহ নেই। ফলে বিদ্যালয় চালু থাকা অবস্থায় নির্বাচনের সময় আর কোনও স্তরের শিক্ষককেই ব্যবহার করা যাবে না, যদি না সেটি ছুটির দিন হয়। তবে এখানে স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রশ্ন উঠেছে যে, যে বিপুল সংখ্যক শিক্ষককের নির্বাচনের সময় নির্বাচন দফতর নেন, সেই চাহিদা মিটিয়ে কী করে? সেখানেও বিচারপতির সাফ জবাব, নির্বাচন না শিক্ষায় উৎকর্ষতা বৃদ্ধি কোন বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিৎ? নির্বাচনের মতো, বিশেষ করে লোকসভা নির্বাচনের মতো বিশাল কর্মকাণ্ডে অসংখ্য সরকারিস্তরের কর্মীর প্রয়োজন হয়। সেখানে এই বিচারপতির এই রায়ের ফলে নির্বাচন কমিশন সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা যে কিছুটা সংকটের মধ্যে পড়বেন তা ঠিক। কিন্তু এটাও সত্য যে, শিক্ষাদানের মতো মহৎ কাজকে মর্যাদা বা গুরুত্ব না দিয়ে এতোদিন যে ভুল করা হয়েছে, তা আশাকরি বোধগম্য হবে প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের। কথাতেই আছে, সমাজ গড়ার কারিগর হলেন শিক্ষক শিক্ষিকারা। তাঁদের ছুটির দিনে সরকারি কাজে লাগালেও বিদ্যালয় চলাকালীন ব্যবহার করা মানে তো শিক্ষাদানে বাধা প্রদান। সুতরাং বিচারপতির রায় যুগান্তকারী বলেই তা অত্যন্ত সাধুবাদযোগ্য।

ব্রহ্মচারী শ্রীঅক্ষয়চৈতন্য বিরচিত

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

ধর্মঠাকুরের পূজা-মহোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইত পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলিতে। কামারপুকুরের 'রাজাধিরাজ' ধর্মের রথযাত্রায় বিরাট মেলা বসিত। কিন্তু সেইদিন বহুকাল গত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাখ-শ্রেণীভুক্ত ও অন্যান্য সকল জাতির বাস কামারপুকুরে। বিজাতীয় শিক্ষার বহির্মুখী প্রভাব হইতে মুক্ত থাকায় তাহাদের জীবনযাত্রা সরল ও ধর্মভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। গ্রামস্থ বৃহৎ পুষ্করিণীগুলি, এবং মন্দিরগুলিও তাহাদের ধর্মার্থে কর্মানুষ্ঠানের সাক্ষ্য দিতেছে। গ্রামটির কামারপুকুরনামের উদ্ভব যে কামারদের একটি পুষ্করিণী হইতে, ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। 'কামারপুকুর' অনুপম বিদ্যমান। শ্রীরামকৃষ্ণলীলার অঙ্গীভূত হইয়া যুগীদের শিবমন্দির, হালদারপুকুর ও লাহাদের চণ্ডীমণ্ডপ মহিমান্বিত হইয়াছে; মন্দির ও পুকুর যথাক্রমে রামানন্দ যুগী ও ফকিরচন্দ্র হালদারের কীর্তি ঘোষণা করিতেছে।

বর্ধমান হইতে কামারপুকুর ষোল ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। বর্ধমান হইতে একটি রাস্তা কামারপুকুরে আসিয়া ও গ্রামটিকে অর্ধবেষ্টন করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে পুরী পর্যন্ত গিয়াছে। গরীব যাত্রী ও সাধুসন্ন্যাসী ঐ পথ দিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে যাইতেছেন। তাঁহাদের বিশ্রামের জন্য লাহাবাবুরা একটি চটি বা পান্থনিবাস নির্মাণ করিয়াছিলেন গ্রামের দক্ষিণপূর্ব কোণে।

গ্রামের দুইদিকে দুইটি শ্মশান আছে; ঈশানকোণে বুধুই মোড়লের ও বায়ুকোণে ভূতির খালের শ্মশান। শেষোক্ত শ্মশানের পশ্চিমে গোচর-প্রান্তর, মাণিক রাজার আমবাগান ও আমোদর নদ। ভূতির খাল দক্ষিণে বহিয়া আমোদরে মিলিত হইয়াছে। আমবাগানের দুইচারিটি বৃক্ষমাত্র অবশিষ্ট আছে।

কামারপুকুরের আধক্রোশ উত্তরে অবস্থিত ভুরসুবো গ্রামে মাণিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে বিপুল ধনের অধিকারী এক ধার্মিক ব্যক্তি বাস করিতেন। সুন্দর ছায়াশীতল আমবাগানটি তিনিই করিয়াছিলেন। সুখসায়রের ও হাতিসায়রের নামক দুইটি অতিবৃহৎ দীঘি আজও তাঁহার কথা মনে করাইয়া দেয়।

এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক শোভাও অতুলনীয়। পুষ্করিণীগুলির কোন কোনটিতে শতদল পদ্ম, কোনটিতে বা নীল কুমুদ বিকশিত থাকিয়া রূপে ও গন্ধে পথিকের মনোহরণ করে।

দিনপঞ্জিকা

১৩ আশ্বিন, ভাঃ ৮ আশ্বিন, **৩০ সেপ্টেম্বর**, ১৩ আহিন, সংবৎ ৫/৬ আসিন বদি, ১৯ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩১, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২৪। **রবিবার,** পঞ্চমী প্রাতঃ ঘ ৬।০৯ পরে ষষ্ঠী শেষরাত্রি ঘ ৪।৩১ মিঃ। রহিণীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।৩৭ মিঃ। অসৃক্‌যোগ রাত্রি ঘ ৮।৫৮ মিঃ। তৈতিলকরণ, প্রাতঃ ঘ ৬।০৯ গতে গরকরণ, দিবা ঘ ৩।৫৩ গতে বণিজকরণ, শেষরাত্রি ঘ ৪।৩১ গতে বিষ্টিকরণ। **জন্মে**— বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ঘ ১।৩৭ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। **মৃতে**— একপাদদোষ, শেষ রাত্রি ঘ ৪।৩১ গতে দ্বিপাদদোষ। **যোগিনী**— দক্ষিণে, প্রাতঃ ঘ ৬।০৯ গতে পশ্চিমে, শেষ রাত্রি ঘ ৪।৩১ গতে বায়ুকোণে। **বারবেলাদি** ঘ ৯।৫৯ গতে ১২।৫৭ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ১২।৫৯ গতে ২।২৯ মধ্যে। **যাত্রা**— নাই। **শুভকর্ম্ম**— দীক্ষা। **বিবিধ**— ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। **ত্র্যহস্পর্শ। স্নানদানে সহস্রগুণ ফল। জননেতা ইরাবৎ দিবস (মণিপুর)** (৩০ শে সেপ্টেম্বর)। **অমৃতযোগ**— দিবা ঘ ৬।২৩ গতে ৮।৪১ মধ্যে ও ১১।৪৫ গতে ২।৫০ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৭।৩৮ গতে ৯।১৮ মধ্যে ও ১১।৫৭ গতে ১।২৭ মধ্যে ও ২।১৭ গতে ৫।৩১ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**— দিবা ঘ ৩।৩৬ গতে ৪।২২ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৩ আশ্বিন, ভাঃ ৮ আশ্বিন, **৩০ সেপ্টেম্বর**, ১৯ মহরম, ১২ আহিন, উঃ ৫।৩০, অঃ ৫।২৩, রবিবার, পঞ্চমী প্রাতঃ ঘ ৬।০৮ পরে ষষ্ঠী শেষ রা ঘ ৪।২৯, সেহরী শেষ ৪।০৭, ইফতার ৫।৩১।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,
সে বন্ধু নয়
মাদক বিরোধী আন্দোলন

দুঃখের তপস্যাই আনন্দের তপস্যা

গদাধর রানা
শেষ পর্ব

বলা হচ্ছিল প্রবৃত্তির কথা। প্রবৃত্তি একান্তভাবেই আমাদের নিজেদের—একথা সত্য, কিন্তু প্রবৃত্তির উপর যদি স্বীয় আধিপত্য না গজায়, ব্যক্তির অবিনাশী সুবিমল সত্তা যদি প্রবৃত্তির আধারেই প্রবিষ্ট হয়ে মাথা কুটে মরে, তাহলে মানুষ অনেক জেনে, অনেক বুঝে, অনেক পেয়েও সেই ক্ষমতা সত্তাপোষণী করে তুলতে পারে না। সেখানেই প্রকৃত সুখানুভূতি জনিত শিক্ষা সকলি ব্যর্থ হয়ে যায়।

এখন মানসিক বৃত্তি কাকে বলে, তা জানার প্রয়োজন। সঠিক বৃত্তিই হচ্ছে ভক্তি! কেমন তবে? যে বিষয় বিশুদ্ধ চিত্তের বৃত্তিতে ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের অভিন্নতাবোধ জন্মে সেই বৃত্তির নামই ভক্তি। সেখানেই প্রবৃত্তি হয়ে যায় সত্তাপোষণী। বলাই বাহুল্য, আমরা সবসময়ই সুখের সন্ধানে ছুটছি। কিন্তু জানি না—কোন্‌খানে সঠিক সুখ পাওয়া যাবে। ঠিক ঠিক সুখ পাওয়া যায় উদ্ভূত যে বৃত্তি অভিভূতি এবং সাদৃশ অভিভূতির স্থায়িত্বজনিত জনমভোরের যে-অবস্থা সেই বৃত্তিস্বারূপ্যকে ভেদ করে সত্তা পৌঁছে যেতে চায় আধিপত্য লাভ করার দিকে। একেই বলে আত্মঅতিক্রমন বা *Self-transcendance*-এর দ্বারায় নিজেকে উপলব্ধি করা যায়—আর তখনই দুঃখসুখের সমুহ প্রাচীর বা সীমানা অন্তর্হিত হ'য়ে যায়। আসল কথা, বৃত্তি-অভিভূতিই আমাদের সদা জাগ্রত শাশ্বত চেতনাকে আপাতদুর্বল ক'রে দেয় ব'লেই যত দুঃখ অকারণেই দস্যুর মতো মনের গভীরে এসে বাসা বাঁধে— যা আমাদের আভ্যন্তরীণ সত্তার বিরোধী হয়। ফলে, দুঃখকেই বড় অশান্ত জ্ঞান ক'রে আমরা জীবকুল সাম্য সংগত চিন্তাধারা থেকে বিচ্যুত হ'য়ে বৈচিত্রের মধ্যে সর্বজনীন ঐক্যকে খুঁজে পাই না। এই জায়গায় আমাদের হৃদয় দেশে দৈবীসত্তিত্বানের নিত্যসত্তা ও বিকাশ বিঘ্নিত হয়। ফলস্বরূপ দুঃখই আমাদের নিত্যসাথী হয়ে সত্যিকার সুখের অন্তর্জলিযাত্রা ঘটে যায় আমাদের অহেতুক দুঃখের অধিদহনে নিত্যসত্তা সর্ব গতেও গতিশীল হয়েও রুদ্ধ বা বাধাপ্রাপ্ত হয়—এজন্য সত্তা দায়ী নয়, দায়ী আমাদের সত্তাপোষণী প্রবৃত্তির ন্যায্য প্রকাশের ঘাতিত বা দুর্বলতা।

পূর্ণ চেতনা লাভের পথে আলোচিত ঐ যে বৃত্তি-অভিভূতি বা বৃত্তিসারূপ্যই অন্তরায় সৃষ্টি করে—ফলে আমাদের দ্বারা দুঃখ ইচ্ছাকৃতভাবেই তৈরি হয়। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে গেলে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন প্রবৃত্তিকে স্বীয় ইচ্ছাধীন করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"দুঃখকে যত সইতে পারা যাবে, ততই সহনশীলতা বৃদ্ধি পেয়ে সুখের প্রতিভাস গড়ে উঠবে।" তাইতো কবি তাঁর কাব্য সংগীতাংশে বললেন—দুঃখ যদি না পাবে তো দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে? বলা যায়—আমরা দুঃখকে চাই না—কিন্তু তার অপসারণের পথই বা কী? দুঃখীজনের দুঃখকে আপন হৃদয়ে অনুভব করাই দুঃখ, অপসারণের প্রথম সোপান। আরও একটি বিষয় হচ্ছে—মানুষ আপন অন্তর্নিহিত দেবত্বকে প্রকাশ করতে পারলেই সর্ব দুঃখের অবসান হয় এবং সেই প্রক্রিয়া কেন্দ্রগতভাবে ত্যাগের দ্বারাই সম্ভব। তাই, দুঃখ অপনোদনের বৃহত্তম তথা সেরা সর্ত হচ্ছে ভোগের মধ্যেই আবশ্যিক ত্যাগের সাধন।

মহাভারতের কুন্তীদেবীও বলেছিলেন, "হে ভগবান! আমাকে সর্বদাই দুঃখের মধ্যে রাখিও। তাহা হইলে আমি তোমায় সর্বদা প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারি। সুখের সময় তোমাকে আমি ভুলিয়া যাইতে পারি, অতএব আমার সুখের প্রয়োজন নাই।" নেতাজী সুভাষও একদা বলেছিলেন, "ত্যাগ, শোক, দুঃখ অত্যাচার না থাকলে জীবনের সুখ, সৌন্দর্য্য বা কোনো বৈচিত্র্য থাকতো না। ডি.ডি. রায় বলেছিলেন, 'সুখের সঙ্গে ছেড়ে কথা দুখের সঙ্গে সহবাস / ইহাই আমার ব্রত হউক, ইহাই আমার অভিলাষ।'

সংসারে দুঃখ বা সুখ দৃষ্টিভঙ্গীর তফাতে ঘটে থাকে। তাইতো দুঃখ সুখকে কখনই নির্দিষ্ট করা যায় না। যেমন, যে-অগ্নি পিণ্ডকে দগ্ধ করে তাই আবার একজন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির উপাদেয় আহার রন্ধন করিতে পারে। যে স্নায়ুমণ্ডলীর দ্বারা অন্তরে দুঃখবোধ প্রবাহিত হয়, সুখবোধও সেই স্নায়ুমণ্ডলীর দ্বারাই অন্তরে নীত হয়।

আমরা দুঃখের প্রতিকার অবশ্যই চাই। কিন্তু, দুঃখের প্রতিকারের আশায় যাই করতে যাই, তাতেই প্রকট দেহাভিমানের জন্য আরও বেশি ক'রেই দুঃখের মধ্যে জড়িয়ে পড়ি।

এখানে প্রশ্ন আসে, আনন্দকে নিয়ে। যে আনন্দ একটা চিরস্থায়িত্বযুক্ত মহান্ প্রেমের পাওনায় সহায়তা করে। এই যে উল্লিখিত আনন্দ, তা আনন্দচিত্তেই দুঃখকে গ্রহণ করে। শিব হচ্ছেন যেমন পূর্ণ আনন্দ। যাঁর মাঝে অনন্তের সর্ব শক্তি বিদ্যামান্ বা বিরাজমান। তাই এটি লক্ষণীয়। শিব স্বয়ং সর্ব আনন্দের আধার হ'য়ে যেমনটি হলাহল পান ক'রে নিজের খুশিতেই নিজে পূর্ণ হয়েছিলেন। আনন্দ তেমনি ক'রে অনায়াসেই দুঃখকে গ্রহণ করে।

অবশ্যই এই আনন্দ সাধারণ মানের সুখজনিত আনন্দ নয়। এই আনন্দ রয়েছে ব্যষ্টি মনের অন্দরমহলে, আছে কারকরণীর পেরিয়ে মহাকরণ স্তরে। আমরা কিন্তু দুঃখবিজড়িত বাহ্য জগতের প্রতিই অধিক আসক্ত প্রাণ। আসল ধর্মজীবনেই আনন্দ। স্বামীজি বলছেন— 'ধর্ম হচ্ছে *impulse towards perfection, search for pure and unmined bliss, Seared sense of immortality* এবং *Divinity in God head.* ঐ সব প্রবৃত্তির চরিতার্থতা যোগেই যথার্থধর্মের জয়জয়কার। তবুও, আরও কেমন ক'রে সেই আনন্দ লাভ হতে পারে? মহাভারতে আছে, "ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।" গুহা অর্থে এখানে হৃদয়। সেখানেই ধর্ম নিহিত। যারা বাইরে থেকে ভিতরে আসতে পেরেছে তাদেরই দুঃখবিবর্জিত ধর্মজীবন আরম্ভ হয়েছে— সেই আনন্দেরই বাস্তবিক প্রয়োজন—তখন দুঃখ, বিরহ বা সুখ নৈব নৈব চ। তবুও বলা যায়। সেই আনন্দের মধ্যেই সমস্ত দুঃখশোক একাকার হ'য়ে মিশে যায়। সকলি তখন আনন্দেরই পূর্ণ আধারে পরিণত হয়। নদী যেমন সহস্রভাবে বাঁকা গতিপথে দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করেই পরিশেষে সাগরে সাথে মিশে গিয়ে একাকার হ'য়ে যায়।

তাই, চিরকালের আত্মগুরুত্ব নিয়ে দুঃখের শতগুণ তপস্যা মনে মনে সংঘটিত করলেও একঅর্থে তা হ'য়ে যায় পরমানন্দের তপস্যারই সমতুল।

প্রকৃতপক্ষে, ভূমাতেই প্রকৃত আনন্দ এবং জাগতিক সহস্র দুঃখের গণ্ডীকে সহনশীলতাসহ পার হ'য়ে যেতে পারলেই সেই আনন্দকে লাভ করা যায় এবং সেটিই পরিশেষে হ'য়ে যায় আনন্দদর্শন সম আনন্দের মহত্তম অনুপ্রেরক।

তথ্যসূত্র ঃ- ১। বিশ্ববাসী, অগ্রহায়ন সংখ্যা, ১৪১৩।
২। উদ্বোধন, ১৪১৪ মাঘ সংখ্যা।
৩। অর্ঘ্য পত্রিকা—আনুড় (২০০৬), কামারপুকুর।
৪। বিশ্ববাসী, ফাল্গুন সংখ্যা, ১৪১৪।

যোজনা ডায়েরি

(মে ২০১৮)

· **ইয়ং সায়েন্টিস অ্যাওয়ার্ড :**

গত ফেব্রুয়ারিতেই ঘোষণা করা হয়ে যে, পুরুলিয়ার কাশীপুরের শিবশঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের খনি মন্ত্রকের 'ইয়ং সায়েন্টিস্ট অ্যাওয়ার্ড' পাচ্ছেন। সম্প্রতি নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের হাত থেকে পুরস্কার নিয়েছেন শিবশঙ্কর। তার গবেষণা আসলে বিশ্ব উষ্ণায়নের সঙ্গে লড়াই। কানপুর আইআইটি-র ভূ-পদার্থবিদ্যার শিক্ষক ওই যুবক জানান, ক্রমশ বাতাসে বেড়ে চলেছে কার্বন ডাই-অক্সাইড। পরিবেশের সেই গ্যাস ভূগর্ভে পাঠিয়ে কিভাবে আরও বেশি জ্বালানি তেল সংগ্রহ করা যেতে পারে, সেটাই তার গবেষণার বিষয়। দীর্ঘ দিন ধরে উত্তোলনের ফলে গুজরাতে ক্যাম্বে বেসিনে জ্বালানি তেলের খনিতে সঞ্চিত তেলের ভাঁড়ারে টান পড়ছে। শিবশঙ্কর দাবি করছেন, সেখানে এই পদ্ধতি ব্যবহার করলে তেলের উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে।

আদত বাড়ি কাশীপুরে। পঞ্চকোটরাজ হাইস্কুল থেকে ২০০২ সালে মাধ্যমিক, তারপরে আদ্রা নিগমনগর নিগমানন্দ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে ভর্তি হয়েছিলেন রঘুনাথপুর কলেজে। পদার্থবিদ্যায় অনার্স পাশ করে ২০০৮ সালে যান বাড়খণ্ডের ধানবাদে জিওফিজিক্স স্কুল অব মাইনসে। ভূতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা শেষ করে হায়দরাবাদের ন্যাশনাল জিওলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টি-টিউটে গবেষণা করার সুযোগ পান শিবশঙ্কর। ২০১১ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত গবেষণা করেছেন। তার পরে শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন কানপুর আইআইটি-তে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

· **প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আশার আলো :**

এমন এক এনজাইম বা উৎসেচক যা কোনও প্লাস্টিক বর্জ্যকেই পড়ে থাকতে দিচ্ছে না। এর আগে পাকিস্তানে আবর্জনার স্তূপে হদিশ মিলেছিল প্লাস্টিক-খেকো একটি বিশেষ প্রজাতির ছত্রাকের। হালে 'প্লাস্টিক-খেকো' এনজাইমের হদিশ পেয়েছেন ব্রিটেন ও আমেরিকার এক গবেষকদল। প্লাস্টিক বর্জ্যের দুষণ নিয়ে আমাদের উদ্বেগের দিন শেষ হওয়ার সম্ভাবনা যে একেবারে অসম্ভব নয়, এবার তারই দিশা দেখালেন গবেষকরা। প্রসঙ্গত, প্লাস্টিকের এক বিশেষ যৌগ 'পলিইথিলিন টেরেফথ্যালেট' (পিইটি বা 'পেট')। ওই প্লাস্টিক যৌগ গিয়ে বোতল বানানোর জন্য প্রথম পেটেন্ট হয়েছিল ১৯৪০-এর দশকে। বোতল বানানোর জন্য প্লাস্টিক পরিবারের ওই বিশেষ যৌগটিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল একটাই কারণে, তা হল—ওই যৌগটি পরিবেশে লক্ষ লক্ষ বছর টিকে থাকতে পারে। হালের গবেষণায় এও দেখা গিয়েছে, প্লাস্টিকের এই বিশেষ যৌগ পলিইথিলিন টেরেফ্‌থ্যালেট-কে পৃথিবীর স্থল ও জলের বেশিরভাগ অংশে দুষণের অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে উঠেছে।

অন্য একটি বিষয় নিয়ে গবেষণা করার সময়েই ব্রিটেনের পোর্টসমাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ও মার্কিন শক্তি মন্ত্রকের অধীনে থাকা ন্যাশনাল রিনিউয়েবল এনার্জি ল্যাবরেটরির (এলআরএএল) বিজ্ঞানীরা ওই এনজাইমটির হদিশ পেয়েছেন। গবেষণকরা দেখলেন, ওই এনজাইমটি একটি বিশেষ ব্যাকটেরিয়াকে সাহায্য করে প্লাস্টিকের বিশেষ যৌগ 'পেট'-কে ভেঙে ফেলতে সক্ষম। সহযোগী গবেষক, পোর্টসাউথ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন ম্যাকগিহান জানিয়েছেন, এনজাইমটির এই ক্ষমতার কথা জানতে পেরে তারা সেই ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা শুরু করেন। তার জন্য তারা কয়েকটি অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রয়োগ করে দেখেন, তাতে এনজাইমগুলি আরও দ্রুত প্লাস্টিক ভেঙে ফেলতে পারছে। এবার গবেষকরা দেখবেন, আগামী দিনে বড়ো বড়ো শিল্পক্ষেত্রেও এনজাইমের কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে তাকে প্লাস্টিক বর্জ্য সাফাইয়ের কাজে লাগানো যায় কি না, বাণিজ্যিকভাবে। তারা এটাও দেখবেন, অন্য প্লাস্টিক যৌগ নষ্ট করার ক্ষেত্রেও এদের ব্যবহার করা যায় কি না। কোনও কোনও বিজ্ঞানী বলছেন, এনজাইম আদৌ বিষাক্ত নয় বলে এই পদ্ধতি খুবই কার্যকর হতে পারে ভবিষ্যতে, শিল্পজাত প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিমাণ কমাতে। তবে এব্যাপারে আরও গবেষণা দরকার।

বিবিধ

· **বেতারের মাধ্যমে 'ডন কোরাস ডে' :**

চাপড়ামারির জঙ্গলে ভোররাতে পাখির ডাক শোনার সুযোগ সব পর্যটক পান না। গত ৬ মে অল ইন্ডিয়া রেডিও-য় পাখির ডাকে সম্প্রচারের দৌলতেই অনেকের সেই সৌভাগ্য হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, এই সম্প্রচার ডুয়ার্সে পাখি পর্যটনের আগ্রহ বাড়াবে সাধারণ মানুষের মধ্যে। এদিন সম্প্রচারের পর অনুষ্ঠানের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক মনিকা গুলাটি জানান, এশিয়া তথা বিশ্বের কাছে এই সম্প্রচার চাপড়ামারি তথা ডুয়ার্সকে চেনাতে সাহায্য করবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত পাখি বিশেষজ্ঞ সুদীপ্ত রায়ের মতে এই অনুষ্ঠান একটা প্রামাণ্য দলিল যা ভবিষ্যতে প্রকৃতিপ্রেমীদের কাজে দেবে। বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে সচেতনতা বাড়াতেও এই উদ্যোগ জরুরি। তাদের মতো অনেকেরই বক্তব্য, পাখির বৈচিত্র্যের কারণে ২১টি দেশের কাছে চাপড়ামারির এই সম্প্রচার ডুয়ার্সে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে। বিদেশিদের কাছে এবার শুধু পাখি দেখার আগ্রহেই চাপড়ামারি অন্যতম গন্তব্য হয়ে উঠবে বলেই বিশেষজ্ঞদের মত। এর জেরে পর্যটকদের নজর পড়বে সমগ্র ডুয়ার্সেও। বন দপ্তরের বন্যপ্রাণ বিভাগের উত্তর মণ্ডলের প্রধান বনপাল উজ্জ্বল ঘোষ নিজেও একজন পাখি বিশেষজ্ঞ। তিনিও মনে করেন, চাপড়ামারির সম্প্রচার উত্তরের জঙ্গলের সুনাম আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দেবে। চাপড়ামারির মতো এই ধরনের 'ডন কোরাস ডে' উদ্‌যাপনের উদ্যোগও ডুয়ার্সের অন্য জঙ্গলে নেওয়ারও প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে।

· **পৃথিবীর প্রচানতম খনিজ :**

পৃথিবীর বয়স প্রায় ৪৬০ কোটি বছর। আর যে-আগ্নেয় শিলার মধ্যে পৃথিবীর প্রাচীনতম খনিজ 'জারকন'-এর খোঁজ মিলেছে, তার বয়স প্রায় ৪২৪ কোটি বছর! এবং ওই আগ্নেয় শিলা রয়েছে পূর্ব ভারতের ওড়িশায় এই গবেষণার অন্যতম বিজ্ঞানী, মালয়েশিয়ার কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্বের শিক্ষক রজত মজুমদার, তার ছাত্রী তথা 'নেচার'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধের মূল লেখিকা ত্রিস্রোতা চৌধুরী এবং এক চিনা বিজ্ঞানী, ইউংশং ওয়ান। এই পাথর বিশ্লেষণ করার জন্য দরকার ছিল 'সেন্সিটিভ হাই রেজলিউশন আয়ন মাইক্রোস্কোপ'। গবেষকরা জানাচ্ছেন, সব থেকে পুরনো জারকন মিলেছে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায়। কিন্তু সেটি আয়েয় শিলা নয়। ওড়িশার চম্পুয়ায় পাওয়া জারকন রয়েছে গ্রানাইট আগ্নেয় শিলার মধ্যে। সেদিক থেকে এই শিলাও প্রাচীনতম। এই খনিজ তৈরি হয়েছে লাভা থেকে।

প্রসঙ্গত, ১৯৮১ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতত্ত্বের দুই শিক্ষক আশিসরঞ্জন বসু ও অজিতকুমার সাহা পূর্ব ভারতের এই আয়েয় পাথরের বয়স ৩৮০ কোটি বছর বলে দাবি করে 'সায়েন্স' পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। কিন্তু অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী সেই দাবির বিরোধিতা করে নস্যাৎ করতে পারেননি ভারতীয় গবেষকরা। এবার সেই পুরনো তত্ত্বকেই আরও জোরালোভাবে তুলে ধরলেন ভারতীয় ও চিনা ভূবিজ্ঞানীরা। 'নেচার' পত্রিকার প্রবন্ধে তারা জানালেন, জারকন-সমৃদ্ধ ওড়িশার ওই আয়েয় শিলার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ বিশ্বে জলের আবির্ভাবের ইতিহাসে নতুন তথ্য তুলে ধরতে পারে।

সংকলক ঃ রমা মণ্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী (বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)

সম্পাদক সমীপেষু

সময়টা শনিবারের বারবেলা

সময়টা শনিবারের বারবেলা। ঘড়িতে ১২টা বেজে ৩ মিনিট। শিবপুর চ্যাটার্জী হাট গার্লস হাই স্কুলে এলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় সমবায় মন্ত্রী শ্রী অরূপ রায় মহাশয়। তিনি এই স্কুলের একটা মাল্টি জিমের উদ্বোধন করে গেলেন। ১৯৬২ সালে শিবপুর চ্যাটার্জী হাট গার্লস হাইস্কুলের যাত্রাপথের সূচনা হয়েছিল। সেই যাত্রাপথের ধারাকে ধীরে ধীরে এগিয়ে এনে আজ সাফল্যের পরিকাঠামোয় তুলে ধরেছে। ৫৬ বছর অতিক্রান্ত করে শিবপুর চ্যাটার্জী হাট গার্লস হাইস্কুল বর্তমানে নবরূপে সেজে উঠেছে। দুশো পঞ্চাশ জন ছাত্রী নিয়ে ৭০, ৭১, ৭২ অবিনাশ ব্যানার্জী লেন, হাওড়া-৪। হাওড়া পৌর নিগমের ওয়ার্ড নং ৩৩-এর অধীনে থাকা এই স্কুলখানি শিক্ষার মন্দির হিসাবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে এগিয়ে চলেছে অগ্রগতির দিকে। সেই স্কুলে শনিবারের এই দিনটিতে একটা মাল্টি জিমের উদ্বোধন হয়ে গেল ১৯শে মে ২০১৮ সালে। এই দিনটাতে শিবপুর চ্যাটার্জী হাট গার্লস হাইস্কুল তাদের মন্দিরে নতুন একটা পালক সংযোজন করে দিলেন মন্ত্রী। মাননীয় মন্ত্রী সাহেব তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরলেন সেই শিক্ষার কথাই। তিনি ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বললেন, সময়টাকে পড়াশোনার মধ্যেই বাস্ত রাখতে। এই সময়টাকে পড়াশোনা করে ভবিষ্যৎকে আরও বেশি করে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। ফাঁকি দিলে সময়টা আর ফিরে আসবে না। সাথে সাথে বললেন, খেলাধূলাও করতে হবে। এতে শরীর ও মন দুইই ভালো থাকবে। তিনি বুঝিয়ে দিলেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা। তিনি সমগ্র ভারতবাসীর মনকে জয় করে নিয়েছেন। তোমরাও একদিন পারবে। তোমাদের শিক্ষা দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছে যেতে। তিনি এই আদর্শটুকু পেয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ার থেকে। এমন সুন্দর ও মনোরম অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৩৩ নং ওয়ার্ডের পৌরমাতা রীতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়া। এই স্কুলের ছাত্রীরা একটা নাটকে অভিনয় করে সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে সাফল্য মণ্ডিত করে তুললো। এমন কিছু ভালো কাজের জন্যই মানুষ বোধ হয় দীর্ঘদিন অপেক্ষায় বসে থাকেন। শনিবারের বারবেলায় তাই কবিগুরুকে মনে পড়ে যায়। তিনি লিখে গেছেন—তব আনন্দ আমার অঙ্গে মেনে/ বাধা যেন নাহি পায় কোনো আবরণে/তব আনন্দ পরম দুঃখে মম/জ্বলে ওঠে যেন শূন্য আলোকসম/তব আনন্দ দীনতা চূর্ণ করি/ ফুটে ওঠে আমার সকল কাজে।

প্রবীর মিত্র
হাওড়া

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য পত্রিকা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উদয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিককেরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২
Email-lipiarambagh@gmail.com

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়